চতুর্থ অধ্যায়

‘সোনার দেশে কেন এল পঞ্চাশের আকাল’ ঃ

বিশেষ পাঠ –

‘মন্বন্তর’ – ‘অশনিসংকেত’ – ‘চিন্তামণি’

চতুর্থ অধ্যায়

'সোনার দেশে কেন এল পঞ্চাশের আকাল' ঃ বিশেষ পাঠ –

'মন্বন্তর' – 'অশনিসংকেত' – 'চিন্তামণি'

১৯৪৩-৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বাংলায় যে প্রবল খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছিল, তা বাংলার এক তৃতীয়াংশ জনতার মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এই 'মন্বন্তর' ধ্বংস করেছিল আমাদের স্থিতিশীল গ্রামজীবন। একদিকে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক সরকার গৃহীত denial policy, অন্যদিকে যুদ্ধের সৈনিকদের সরবরাহের জন্য চাল সহ সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তু অধিগ্রহণ, পরপর দুসনের আংশিক অজন্মা, যুদ্ধের বাজারে নিয়ন্ত্রণহীন কালোবাজারি ও মজুতদারি, প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিমজুরদের উপর নির্মম সামন্তবাদী শোষণের অভিশাপ— সবগুলি উপাদান একসঙ্গে মিলে এক অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে ১৭৭৬ এর মন্বন্তর এর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছিল। পুনরায় বিশ শতকে ফিরে আসে সেই দিন। তবে দুয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে প্রথমটি ছিল একান্তভাবেই প্রকৃতির মার— একে প্রতিরোধ করার মতো সংগঠিত শক্তি হয়ে ওঠেনি সেকালের রাষ্ট্র। আর ১৩৫০ এর আকালের অঞ্চলের পর্বে প্রকৃতি ছিল না ততটা বিরূপ। রাষ্ট্রও ছিল অনেক বেশি সংগঠিত ও সহ্লম। তবু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, জমিদারি শোষণ— কালোবাজারি-মুনাফাখোরদের শ্রেণিস্বার্থ সমন্বিত এক ষড়যন্ত্রে বিশ শতকের মানুষ একদিন আশ্চর্য হয়ে দেখল,"না খেয়ে আবার লোক মরে ?।"[১]

১৯৪৩-৪৪ সনে বাঙালি প্রত্যহ্ল করেছে না খেতে পাওয়া মানুষের মিছিল। হয়তো ঠিক মানুষ নয়, কবিতায় বর্ণিত মানুষের মতো অদ্ভুত এক জীব ঃ

নগরের পথে পথে দেখেছে অদ্ভুত এক জীব

ঠিক মানুষের মতো

কিংবা ঠিক নয়।

যেন তার ব্যঙ্গ চিত্র বিদ্রুপ বিকৃত।

তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর

জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়।

উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে ব'সে ব'সে ধোঁকে

আর ফ্যান চায়।[২]

এটা ১৯৪৩-৪৪ এর মন্বন্তরের এক মর্মস্পর্শী ছবি। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে অনাহারে মরেছে। এই মহামন্বন্তর থেকে, তার ভয়াবহতার ছোঁয়া থেকে দূরে থাকতে পারেন নি সংবেদনশীল মানুষেরা। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গায়ক প্রত্যেককেই এই মন্বন্তরের ভয়াবহতা নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তাই একে নিয়ে রচিত হয়েছে সলিল চৌধুরীর কালজয়ী বিখ্যাত গান 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন' তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'। গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস এমনি আরো অজস্র রচনা। আমরা এই অধ্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনিসংকেত' এই তিনটি উপন্যাসের আলোচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের আকালের ছবি কতটুকু ফুটে উঠেছে তা দেখার চেষ্টা করব।

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭১) লিখেছেন 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি। শহর জীবনকে পটভূমি করে লেখা এটি তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস। ১৯৪৩ এর পূজা সংখ্যা আনন্দবাজারে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ আকারে অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। উপন্যাসটি লেখকের চলিত ভাষায় প্রথম রচনা। "ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান পরিচয় তিনি রাঢ়ের জীবনযাত্রার সরল পাঁচালীকার। তাছাড়া হুবহু জমিদারজীবন

ও ছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম পটভূমি। গ্রামীণ পরিবেশই ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্য রচনার বিচরণক্ষেত্র, তবে নাগরিক জীবনের পরিচয়ও তাঁর উপন্যাসে লভ্য। নগরজীবন নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মন্বন্তর'(১৯৪৪)।"[৩]

তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া কলকাতা থাকাকালীন 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ' এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪২ সালে। এভাবেই মার্কসবাদীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযাগ ঘটেছিল। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এই উপন্যাসটির কালসীমা ১৯৪২ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ এর মার্চ পর্যন্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন কলকাতার নাগরিক জীবনই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই উপন্যাসে লেখক বাংলাদেশের যুদ্ধপরিস্থিতির বিপর্যয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন এবং বাংলায় মন্বন্তরের কারণ হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সমস্যাকেই দায়ী করেছেন। যুদ্ধশঙ্কিত, দুর্ভিক্ষ — পীড়িত মানুষের বেদনা তাঁর মতো সামাজিক ও সংবেদনশীল মানুষকে আঘাত করেছিল। তারই ফল এই 'মন্বন্তর' উপন্যাস। এই উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "ইহাতে লেখক বোমাবর্ষণভয়ে আতঙ্কবিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির দারুণ দুর্দশা, মহাত্মাগান্ধীর একবিংশতি দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষে সমস্ত দেশের অসহ্য উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের চিত্তকে তদানীন্তন কালে আলোড়িত করিয়াছে, সেইগুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"[৪] লেখক যুদ্ধ-সমকালীন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে কোলকাতার চলচ্ছবি রচনায় যে লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু বাস্তবসম্মতই নয়, নৈর্ব্যক্তিক ও বটে।

উপন্যাসের আলোচনার শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে 'মন্বন্তর' নাম হলেও শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। "যতই অন্নাভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটুক, এই কাল মহাকালের প্রলয় নৃত্যের এক পদপাত ছিল। এদেশের সমাজে ও জীবনে যুগবিপ্লবের দামামা বেজেছিল। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, আরও ব্যাপক বিশাল কিছু। সেই অর্থেই বইয়ের নামটি বুঝতে হবে।"[৫] কোলকাতা যাদিও প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র নয় কিন্তু রণদামামা যেন সর্বদাই পরোক্ষভাবে সেখানে বেজে চলেছে। লেখক এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন একেবারে সমকালে দাঁড়িয়ে যখন এসব ঘটনা ঘটছে।

এই উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য মূলতঃ তিনটি দিককে আশ্রয় করে প্রকাশিত হতে চেয়েছে। প্রথমত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সমস্যা ও সমস্যার চূড়ান্ত পরিণতিতে বাংলায় মন্বন্তর। দ্বিতীয়ত 'পচনশীল বিলাসীর গৃহের পতন'ও তার কারণ বিশ্লেষণ উপন্যাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। তৃতীয়ত, যুদ্ধ ও মন্বন্তরজনিত সামাজিক বিপর্যয়কালে কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের সক্রিয় তৎপরতা দেখানোও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের কাহিনি সুবিন্যস্ত নয়। খণ্ড খণ্ড কাহিনির দ্বারা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কানাই চরিত্রটিকে উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে রেখে লেখক তাঁর বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর উপন্যাসের প্রারম্ভেই ঘটনাকালকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। "বিংশ শতাব্দীর বিয়াল্লিশ বছর পার হতে চলেছে।"[৬] অর্থাৎ ১৯৪২র শেষের কোলকাতা। সেখানে সরাসরি যুদ্ধের প্রভাব না পড়লেও যুদ্ধজনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছিল। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। একজন ভিক্ষুকের সংলাপে এই বাজারদর বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায়। "তা মশায় কাল যুদ্ধ লেগেই যে সর্বনাশ করে দিলে গো! চালের দর কি মশায়? আগুন! আট আনায়

এক সের চাল।”[৭] নিজের খাদ্য তারা সন্তানকে দিয়েছে। নিজেদের জলখাবার তারা আগেই বন্ধ করেছিল। এখন ছেলেদের জলখাবার বন্ধ করতে হবে তাদের। উপন্যাসে মন্বন্তরের কথা প্রথমেই আসেনি। এসেছে অনেক পরে। যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নানা দুর্ভোগের শিকার হয়। কন্ট্রোলের সামনে লম্বা লাইন। জিনিসের দর আজ নাকি হঠাৎ এক লাফ দিয়েছে। চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলে না। কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এ বেলায় গেলে ও বেলার আগে ফেরা যায় না। কাপড়ের বাজার আগুনের মতো উত্তপ্ত। এমনকি জীবনদায়ী ওষুধের দামও অগ্নিমূল্য। উপন্যাসে কানাইর সহযোগী খবরের কাগজের গুণদাবাবুর ছেলের টাইফয়েড জ্বরের সময় তিরিশ টাকা দিয়েও ওষুধ জোগাড় করতে না পারার জন্য মৃত্যু হয়।

দুর্ভিক্ষ অকৃষিজীবী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের যেমন মারাত্মক ক্ষতি করেছিল, তেমনি বাঙালির মূল্যবোধকেও কেড়ে নিয়েছিল। গোপাল হালদার তাঁর ‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’এ লিখেছেন— “মন্বন্তরের দিনে তারা দেখতে লাগল তাদেরই পরিজন- প্রতিবেশির মৃত্যু,— দেখল সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, সংসারধর্ম বিনষ্ট হচ্ছে। চিরদিনকার মায়ামমতা, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-বাৎসল্য সব সমাধি লাভ করছে। যা কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে ওঠে, যা আশ্রয় করে সমাজ পত্তন হয়,— সেই মূল সামাজিক বন্ধন অনুভূতি সব হ্রয়ে যেতে লাগল— সে সবই আবার মুনাফার এক নতুন উপকরণ হল। অন্নহীনের ঘর-দুয়ার, বাসন-কোসন, জমিজমা শেষপর্যন্ত পুত্রকন্যা এবং স্ত্রীলোকের দেহ পর্যন্ত এই মুনাফাখোরের বড় বড় পণ্য হয়ে উঠল। মুনাফার মৃগয়া মানুষের মৃগয়ায় পরিণত হল।

দিগভ্রান্ত নরনারীর লক্ষ্য হয়ে পড়ল— “যে করে পারি আপনাকে বাঁচাই” এই সমাজবিরোধী আত্মরক্ষার বুদ্ধি, আর মুনাফার কাণ্ডারীদের মন্ত্র হয়ে উঠল— ‘যে করে পারি

এবেলা লুটে নিই'— এই সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতার পথ। ... শিক্ষিত ভদ্র সমাজ প্রথমে বিস্ময়ে দেখেছিল এই নতুন শক্তির অভ্যুদয়— ঠিকাদার এবং মুনাফাদারদের অসাধু ব্যবসায়,-- ঘৃণাও করেছিল। আহতও হয়েছিল দেখে মন্বন্তরের মুখে দায়সারা মান মর্যাদার পরাজয়। ..... তারাও মেনে নেয় আজ মুনাফার শিকারেই মুক্তি, তারাও সহিংস দৃষ্টিতে দেখল উচ্ছল মদগর্বিত সমারোহ পথে ঘাটে, বাসে, বাজারে — একেবারে পারিবারিক আদান প্রদানে - তারাও মানলে এই শক্তিকে, আর একটু একটু করে তারাও সেই নতুন আদর্শের দ্বারা, কবলিত হল - সেই শুভবুদ্ধি, এই ভদ্রতার আদর্শ, সেই দেশপ্রীতির, সেই দুর্গত সেবার পরিবারে এবং পরস্পরের প্রতি মায়া মমতার সেই বন্ধন তারাও বিসর্জন দিতে লাগল।"[৮]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যারা বেঁচে গেল তারাও একধরণের মৃত্যুর মুখোমুখি হল। এই পতনের ছবি মন্বন্তরেও আমরা পাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে শুরু হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি, কন্ট্রাক্ট পারমিটরাজ, ভেঙে পড়েছে সমস্ত মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন। গীতার বাবা প্রদ্যোতের পিতামহ ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি দিতে চাইলে ম্লেচ্ছদের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। সেই পণ্ডিত বংশের সন্তান প্রদ্যোত এবং তার স্ত্রী গীতার শরীরের বিনিময়ে সেই চূড়ান্ত সংকটের দিনে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হয় না। গীতার মা গীতাকে বলে পাঠায়— - "বামুনদিদি যা বলবে, তাই শুনিস মা! তোর দৌলতে যদি দুটা খেতে পরতে পাই, নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।"[৯] গীতার মা গীতাকে বেচে দিয়েছে এবং গীতাদের অসহায়ত্বদের সুযোগ নিয়ে সে সময় একদল নারী ব্যবসায়ী নারীদেহের ব্যবসার মতো ঘৃণ্য কাজ শুরু করেছিল। আর অসহায় মেয়েগুলো নিজের ও পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।কিন্তু তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে 'নবজীবনের গান' শুনিয়েছেন। গীতা মার

ষড়যন্ত্রকে মেনে নেয় নি। সে অদৃষ্টকে ভাগ্য নিয়ন্তা না ভেবে কানাইয়ের সঙ্গে এসব থেকে দূরে গিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।

যুদ্ধের সুযোগে বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল চোরাবাজার বা কালোবাজার। এই উপন্যাসে লেখক কালোবাজারের স্বরূপ চিত্র এঁকেছেন। কানাই গীতাকে ভদ্রভাবে বাঁচার সংস্থান করতে নিজে তার ছাত্র অশোকের ব্যবসায়ী বাবার দ্বারস্থ হয়েছে। অশোকের বাবা যুদ্ধের বাজারে একজন ব্যস্ত মজুতদার। সে নতুন নতুন ব্যবসা ফেঁদে চলেছে। কানাইকে চালের এজেন্ট হিসেবে কাজ দিতে রাজী হয়ে গেল। অমলের সঙ্গে তাদের বিজনেসের দুনিয়ায় ঢুকে কানাইয়ের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। তার মনে হল "কুবের এবং লক্ষ্মীতে জুয়া খেলা চলছে। লক্ষ্মী ক্রমাগতই হেরে চলেছেন। খেলার দান দিতে তাঁর অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডারের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে রাখতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। পৃথিবীর শস্যক্ষেত্র, চাষির খামার, দুর্গম অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী উত্তপ্ত অন্ধকার ভূগর্ভ— যেখানে যতকিছু সম্পদ তাঁর আছে। সমস্ত স্থান থেকে সেই সমস্ত সম্পদ এসেছে কুবেরের ভাণ্ডারে।"[১০] পরিহাসের ভঙ্গিতে অশোক বলে যদি তাদের গুদামের সব চাবি এক সপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আট দিনের দিন বাংলাদেশে উনুন জ্বলবে না। গরীবের জীবনবিদারক কী নিষ্ঠুর এই উক্তি। মুষ্টিমেয় মানুষের অতিরিক্ত লোভ ও স্বার্থ বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই খাদ্যভাব ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে দুর্ভিক্ষে।

অবশ্য উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাবের ছবি রয়েছে শেষে। প্রথম ও মধ্যভাগে যুদ্ধ ও কলকাতায় বোমা বর্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধকালীন বোমাবর্ষণ কলকাতা শহর ও সংলগ্ন অঞ্চলে হতাহতের বর্ণনার অনুপুঙ্খতায় লেখক এখানে বাস্তবের বীভৎসতাকে ছুঁয়েছেন— "একটা বস্তির ওপরে বোমা পড়েছে। কতকগুলি নিরীহ হতভাগ্য— উঃ, সে কি দৃশ্য— কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে, কারও বুকে কারও পিঠে স্প্লিন্টার ঢুকে ছিন্ন ভিন্ন

করে দিয়েছে। বস্তির মধ্যে কাটা হাত-পা আঙুল এখনও পড়ে আছে।"[১১] কলকাতার বুকে বোমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের ছবি রয়েছে । রাত্রি হলে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে 'কৃষ্ণনাম' করে সময় পার করছে লোক। আবার 'অলক্লিয়ার'ঘোষণা হলে লোকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে— "হাওড়া ব্রিজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। দেশোয়ালীরা দেশে পালাচ্ছে, মারোয়াড়ীরা চলেছে মারোয়াড়, ধনীরা চলেছে মধুপুর, দেওঘর, শিমূলতলা, বেনারস: কেরাণীরা পালাচ্ছে নবদ্বীপ, কাটোয়া, বর্ধমান, বোলপুর, নলহাটি। নিজের বাড়িতে, ভাড়াটে বাসায় সাজানো সংসার, আসবাবপত্র— মানুষের যথাসর্বস্ব পড়ে রইল— মানুষ পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে।[১২] ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি পর্যন্ত জাপানি বোমা আক্রমণের এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন লেখক। এই প্রাণান্তকর বোমাবর্ষণের ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল নীলার ছোট্ট ভাইঝিটি। "বিস্ফোরণের আতঙ্কে মা কাঁপতে কাঁপতে শিশুর মুখে স্তন দিয়ে সজোরে তাকে বুকে চেপে ধরেছিল,— শিশু যত চঞ্চল হয়েছে, মায়ের বাহুবেষ্টনী ততই দৃঢ় হয়েছে— গভীরতর আতঙ্কের মধ্যে শেষে সে যখন শান্ত শিথিল হয়েছিল— তখনও মা তাকে ঘুমন্ত ভেবে বুকে চেপে ধরে বসেছিল। কিন্তু তার মধ্যেই শিশু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে।"[১৩]

এই প্রাণান্তকর দুর্যোগের পাশাপাশি লেখক তীব্র খাদ্যাভাবের ছবিও তুলে ধরেছেন। দেশে যুদ্ধের কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, এরকম আশঙ্কা উপন্যাসে শুরুর দিকেই রয়েছে। ক্রমশ উন্মোচিত হয় দুর্ভিক্ষের পট। দলে দলে অসহায়-নিরন্ন মানুষ ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করছে। অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষের করুণ আর্তি চোখে জল এনে দেয়। পথের ধারে ধারে কঙ্কালসার মানুষের সারি। "রাস্তায়, গৃহস্থের দরজায় নিরন্ন মানুষের দল। নিচে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেউ কাতর স্বরে বলছে— মা-মাগো। চারটি ফেন ভাত দাও

গো মা! তোমার পায়ে পড়ছি গো! মা- মাগো! মা— ! মাগো!

নীলা বের হতেই তার পথরোধ করে দাঁড়ায় তিনটি কংকালসার ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে।— মা, দুটি ভাত। আমার ছেলে ক'টাকে দুটো ভাত দেবা মা?"[১৪] 'মা দুটি ভাত, একটু ফেন, দুটো এঁটো -কাঁটা দাও মা' বলে অনবরত চেঁচিয়ে চলেছে। সমস্ত নগরীতে খাদ্যাভাব ছড়িয়ে পড়েছে। নিরন্ন মানুষের খাদ্যের জন্য, বাঁচার জন্য মর্মভেদী চিৎকার। চালের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। দরিদ্র মানুষের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। আর গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার শরণার্থী তো একেবারেই নিঃস্ব-রিক্ত। এদের ভিহ্লা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অথচ যুদ্ধের এই খাদ্যাভাবের দিনে ভিহ্লারও অভাব। ফলে অনাহারক্লিষ্ট মানুষ পথে পড়ে অন্নাভাবে মৃত্যুবরণ করে। উপন্যাসটিতে রয়েছে এই অনাহারে মৃত্যুর বর্ণনা। "কঙ্কালসার মানুষের সারি। রাস্তায় গৃহস্থের দরজায় নিরন্ন মানুষের দল— দুটো এঁটো কাঁটা দাও মা..... দু-একটি অনাহারে মরতে আরম্ভ করেছে। সেদিন একটা বাজারে ডাস্টবিনের পাশে একজন পুরুষ মরে পড়েছিল। কাল একটা ওষুধের দোকানের সামনে একটা পুরুষ ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে মরেছে।"[১৫]

তারাশঙ্কর উপন্যাসটিতে সংবাদপত্র ও সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি তুলে রিপোর্টাজধর্মী চিত্র তুলে ধরেছেন। সম্পাদকীয় মন্তব্যের পৃষ্ঠা — এখানেও একটা ছবি। "..... রণদানব পাক দিয়ে নাচছে। তার গায়ে লেখা — ৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩ —। এইবার সে মাটির দিকে চেয়ে তুড়ি দিয়ে বলছে— এসো এসো। মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কালসার, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, লোলুপ হাঁ করা প্রায় নগ্ন এক বিভীষিকাময়ী নারীমূর্ত্তি। সে দুর্ভিহ্ল। তার পায়ের তলা থেকে আরও একটি মুখ উঁকি মারছে। সে মুখে আবার চামড়ার আবরণও নেই। সে মহামারী। আকাশে উড়ছে চিল-শকুনি, গোলা ফাটছে, প্লেন উড়ছে। ধোঁয়ায় সূর্য দেখা যায় না, সমস্ত ঝাপসা, নীচে লেখা নববর্ষ- ১৯৪৩।"[১৬]

মন্বন্তর যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে অন্যতম নারীর সম্ভ্রমহানি। এই উপন্যাসে লেখক এই সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন। পিতামাতা কর্তৃক নিজ সন্তান বিক্রয়, যুবতী নারীর সতীত্বের বিনিময়ে পরিবারে খাদ্যের সংস্থান— এই সমস্ত বিষয় লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এখানে গীতা চরিত্রের মধ্যে এই মানবিক মূল্যবোধের সকরুণ পরাজয়ের চিত্র রয়েছে। যুদ্ধের সুযোগে মুনাফালোভী কিছু মানুষ চোরাকারবারের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে ওঠে। সেই সমস্ত অসৎ ধনী ব্যক্তিরাই দুর্ভিক্ষের সুযোগে নারীর সতীত্ব লুণ্ঠনে তৎপর হয়ে ওঠে। গীতা অমলবাবুর ব্যাভিচারের বলি হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিজয়দার চিঠিতে জানা যায়— মানুষ মরছে, দলে দলে দেশত্যাগ করছে, স্ত্রী কন্যা ফেলে পালাচ্ছে। সন্তান বিক্রি করছে। বিশেষ করে কন্যা সন্তান। এখানেও অসহায় নারীর সম্মান বিক্রির দিকটি ইঙ্গিতে পরিস্ফুট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজের নিখুঁত ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন— "যুদ্ধের প্রভাবে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে, যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে জেগে উঠছে, এবং অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায় ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে, সে কথাটাই বলবার ছিল।"[১৭]

'মন্বন্তর' উপন্যাসের আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে 'পচনশীল বিলাসীর গৃহের পতন'। যুদ্ধের রথচক্রতলে নিষ্পেশিত হয়েছে ক্ষুধাতুর অসহায় মানুষ, আর সেই পটভূমিতে লেখক ধনী বনেদী বিকৃত পরিবারগুলির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই সমাজে মুল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের বাস্তবতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। বাইরের হাওয়া এসে ঘরে ঢোকেনি। কানাইয়ের পূর্বপুরুষ সুখময় চক্রবর্তীর বংশধরেরাও কালের সে হাওয়া গায়ে লাগায় নি। ফলে ১৯৪২ সালেও তারা মধ্যযুগের মানুষ। এই চক্রবর্তী বাড়ির লোকেরা প্রায় সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত। সুখময় চক্রবর্তীর ছেলেদের জুড়িগাড়ি যখন রাস্তায় বের হতো, তখন দুধারে লোক চেয়ে

দেখত। কিন্তু রঘুপতির কোশলনগরী, যদুপতির মথুরা যেখানে বিলুপ্ত হয়ে যায় সেখানে সুখময় চক্রবর্তীদের অধঃপতন তো স্বাভাবিক ঘটনা। "সুখময় চক্রবর্তীর কালে যাদের প্রয়োজন ছিল, বর্তমান কালে তাদের উপযোগিতা গত হয়েছে, They have played out their part তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই আজ অমলবাবুরা হয়ে দাঁড়িয়েছে অকালের বর্ষার মত। বর্ষাকালে বর্ষণে ফসলে ভরে ওঠে পৃথিবীর বুক, অকালের বর্ষার বর্ষণ পাকা ফসলে ধরিয়ে দেয় পচন।"[১৮] একদিন রাজপুত্র গৃহত্যাগ করে নির্বাণ খুঁজেছে, রাজা সর্বস্ব দান করে চীর পরিধান করেছে— কিন্তু সেই শ্রেণির আজ কোনো সদর্থক সামাজিক ভূমিকা নেই। তার বদলে জায়গা নিয়েছে কালোবাজারী অমলবাবু। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মজুতদার ব্যবসায়ীদের সে সফল প্রতিনিধি। দীন-দরিদ্র- অসহায় মানুষদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সুযোগে গীতার মতো নারীদের সতীত্ব লুণ্ঠনে দ্বিধাহীন। অন্নাভাবে ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীর মর্যাদা কোথায় নামতে পারে তারই একটি করুণ ছবি পাই এই উপন্যাসে। দুটি অন্নক্লিষ্ট মূর্ছিত আহত মেয়েকে সেবাযত্ন করে ভালো করে তুলে নীলা ও গীতা। একটু সুস্থ হয়েও মেয়েটির কান্না থামে না। এতে গীতা ও নীলা বিস্মিত হয়। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মহিলা জানায়, সে চাল না পেলে তার তিনটি সন্তানকে কি খেতে দেবে'? গীতা তার সন্তানদের পাঠাতে বললে সেই মেয়েটি বলে তার ছেলেরা ছোট, মেয়েটি সোমত্থ। তাকে চাল আনতে পাঠাতে বললে— মেয়েটি বলে —"আপনারা বড়োলোকের মেয়ে। গরীব মেয়ের ললাট জানা। সোমত্থ মেয়ে— কিউয়ে দাঁড়ালে— ভদ্রলোক ইসারা করে, বদমাইস গুণ্ডারা যা তা বলে।"[১৯]

বোঝা যায় দুর্ভিক্ষ শুধু মানুষকে প্রাণেই মারেনি, অস্তিত্বেই পচন ধরিয়েছে। কানাই অমলবাবুদের হালফ্যাশনের কেতাদুরস্ত বাড়িঘর, পোশাকপরিচ্ছদ দেখে। এবং চালের এজেন্ট হিসেবে প্রথমদিন একশ মণ চাল' বিক্রি করে 'আড়াইশো টাকা' কমিশন পায়। কিন্তু তার

দেখার আরো বাকি ছিল। বাড়ি গিয়ে সে গীতার কাছে জানতে পারে অমল ঘটকের মাধ্যমে গীতার সর্বনাশ করেছে। কানাইর মনে হয় "কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চনা করে যে সম্পদ সঞ্চয় করে মানুষ, সে সম্পদ গুপ্ত ব্যাধি! সেই ব্যাধির তরুণ উপসর্গ আজ অমলবাবুর মধ্যে দেখা দিয়াছে। কালে ওই বংশটাও হবে তাদের অর্থাৎ চক্রবর্তী বংশের মত।"[২০]

লেখক কানাইয়ের মাধ্যমে যেমন পূর্বপুরুষের পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত রেখেছেন, তেমনি সেই সময়কার পরিবর্তমান সমাজের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কানাই তার পরিবারের জন্য দুঃখ পেয়েছে। তার মনে একই সঙ্গে করুণা ও যন্ত্রণার উদয় হয়েছে। এই পরিবারের পাশেই রয়েছে 'বস্তি' অঞ্চল, যেখানে, 'আধা ভদ্রলোক', জীবনযুদ্ধে হ্লতবিহ্লত মানুষ বাস করেন, যারা যুদ্ধের বাজারে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে তা শোধ করতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটান। এদের যন্ত্রণা কানাইয়ের মধ্যে ছড়ায়। তাই সে কমিউনিস্টদের দলে যোগদান করে। কমিউনিস্ট দল মেদিনীপুরের সাইক্লোন বিধ্বস্ত অঞ্চলের রিলিফের জন্য জলসার মাধ্যমে টাকা তোলে। তারাশঙ্কর কলকাতা বাসকালে কমিউনিস্টদের যে কর্মতাপরতা দেখেছিলেন, তা এই উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নীলা ও নেপী দুজনেই তাদের সমিতিভুক্ত। এরা দুজনেই বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করে পরিস্থিতির প্রতিবাদ ও প্রতিকারের পথ খোঁজে।

৪২ – ৪৩ এ কোলকাতা জাপানীদের বোমা আক্রমণের ভয়ে তটস্থ ছিল। চট্টগ্রাম–কক্সবাজার অঞ্চলে বোমাবর্ষণের কথা আমরা উপন্যাসটির মাধ্যমে জানতে পারি। "ডিসেম্বর মাসের পরের দিনের মধ্যে চট্টগ্রামে তিনদিনে চারবার বমিং হয়েছে"।[২১] এদিকে দিনকে দিন পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠছে। যদিও কলকাতায় মন্বন্তর হয়নি। তবুও সেখানেও চাল তেল পাওয়া যাচ্ছিল না। কন্ট্রোলের সামনে লম্বা লাইন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়েও জিনিসের দর হঠাৎ এক লাফ দিয়েছে। চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলে না। কেরোসিনের

কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এ বেলায় গেলে ও বেলায় আগে ফেরা যায় না। সাধারণ লোকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ডিসেম্বরের ১৫ই তারিখে চট্টগ্রামে ও ফেনীতে আবার বোমা পড়ল।

যুদ্ধ ও তার বংশের অভিশাপের কথা কানাইয়ের মনে চূড়ান্তভাবে গেঁথে বসেছে। তার ও নীলার সুখের নীড় গড়ার স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। নীলার দাদারা চলে গেছে, সংসারের দায়িত্ব নীলার কাঁধে এসে পড়ে। কানাইয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা তাই আপাতত স্থগিত থাকে। সংবাদপত্রে মেদিনীপুরের ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের দুর্দশার খবর পড়ে নীলা ও দেবপ্রসাদবাবু সুখে থাকতে পারার জন্য লজ্জায় কৃচ্ছ্রসাধন করে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সমানভাবে দুঃখের ভাগীদার হয়। নেপী ও বিজয়দা নিঃস্বার্থভাবে দুর্গতদের সেবায় মেতে উঠেছিল। নেপীর একনিষ্ঠতায় কানাইও এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। রিলিফের কাজে কানাইও সর্বশক্তি নিয়োগ করে। আর বিজয়দা তো সমাজকর্মী। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে মানুষের দুর্দশা মোচনে বদ্ধপরিকর। "গতবছরের ডিনায়েল পলিসি, এবছরের অজন্মা, এর ওপর চোরাবাজারের কালো কাপড় ঢাকা হাত ধান টেনে নিচ্ছে.....।"[২২] এই মর্মান্তিক বাস্তব বিজয়দার চোখ এড়ায় না। শুধু প্রশাসনের নির্বিকারত্বকে এ ভয়াবহ পরিস্থিতি টলাতে পারে নি।

অবশ্য উপন্যাসটিতে শেষপর্যন্ত তারাশঙ্কর মহাত্মা গান্ধীর তিনসপ্তাহের অনশনকেই বড় করে দেখিয়েছেন। কোলকাতার মানুষের দুর্গতি ও সংগ্রামকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় বোম্বেতে মহাত্মাগান্ধীর তিন সপ্তাহের অনশন। তারাশঙ্করের বিশ্বাস একমাত্র মহাত্মাজীই পারেন এই বিপদের থেকে ভারতকে মুক্ত করতে। আর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলে সত্যের জয় দেখে উচ্ছ্বসিত কমিউনিস্ট বিজয়দা লেখে "এই মন্বন্তরের ঐ পূণ্যফল আমাদের সর্বোত্তম ভরসা। আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ঐ পূণ্যে।"[২৩] এ তারাশঙ্করের নিজের বিশ্বাস। যা বিজয়দার

লেখনিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপন্যাসে আগাগোড়া দুর্ভিক্ষের যে বীভৎস বাস্তবচিত্র, শেষপর্বে মহাত্মাগান্ধীর ত্যাগ ও দর্শনের মাধ্যমে ওই শোচনীয় অবস্থা থেকে নতুন জীবনে উত্তরণের প্রত্যয়ী দ্যোতনায় এক একবার মনে হয় ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'— এর মতো মন্ত্রে বিশ্বাস রেখেছেন। অবশ্য এই বিপর্যয়ের মধ্যেও লেখক দেখেছেন ভবিষ্যত পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ধর্মতলার ফুটপাতে জুতো পালিশের সারিবন্দি বালক ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিন্দুস্থানী ও মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে দেখে ভাবেন, "জাতি ধর্ম-বর্ণ সমস্তের অতীত। ধরিত্রীর বুকের রূপ হতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বহমান প্রাণশক্তির প্রবাহ একান্ত নিরাসক্তভাবেই মুক্তির নবকলেবরে প্রয়াণ করছে।"[২৪] আর কানাইয়েরও মনে হয়েছে "মানুষ মহৎ। মহত্বের পবিত্রতম লোকে তার যাত্রা চলেছে। এ যাত্রায় সে একদিন না একদিন লক্ষ্যস্থানে পৌছঁবেই। অমৃতের সন্তানদের সমাজ গড়ে উঠবে সেদিন।"[২৫] সমস্ত বিনষ্টির মধ্যেও মঙ্গলময় অগ্রগতির পথ চিরমুক্ত— এই বলিষ্ঠ আশাবাদেই 'মন্বন্তর' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪- ১৯৫০) বিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। প্রকৃতি, অধ্যাত্ম ও সাধারণ মানুষ— এই তিনের সমন্বয় ও সংলাপে বিধৃত তাঁর উপন্যাসের জগৎ। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ বিষয়ক যে সমস্ত কাহিনি তিনি লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম 'অশনি সংকেত'। 'অশনি সংকেত' এর আলোচনা করতে গিয়ে এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "একুশ শতকে দাঁড়িয়ে পূর্ব শতকের যা-কিছু স্মরণ করার তার মধ্যে কিছু শুভ মূহূর্ত আছে, কিন্তু অশুভ মুহূর্তই হয়তো বেশি, আর তার মধ্যে অশুভতম মুহুর্ত হয়তো ১৩৫০ সাল- মানুষের তৈরি সেই মহামন্বন্তর। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের কথা

ভাবতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে তাঁর মন্বন্তরের কাহিনি— 'অশনি সংকেত' এর কথা, তার কঠিন হৃদয়বিদারক বাস্তবতার কথা।"[২৬]

অথচ এই ধরনের রচনা বিভূতিভূষণের হাতে স্বাভাবিক নয় বলে অনেকের অভিমত। কারণ সেই সময়কার 'কল্লোল' এর বাস্তববাদী লেখকগোষ্ঠীর থেকে তিনি ছিলেন শতযোজন দূরে। তিনি পল্লীপ্রকৃতির নিভৃত নির্জনে বাস করে তার শান্ত সমাহিতও সাধারণ জীবনকথার রূপকার। অবশ্য বিভূতিভূষণ শুধু মাত্র প্রকৃতির রূপকার নন। তাঁর রচনার ঔপনিবেশিক ভারতের যথার্থ ছবি ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের ক্ষুধার জ্বালার বাস্তবরূপ তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণের টেকনিকের আলোচনা করতে গিয়ে দেবেশ রায় বলেছেন— "বিভূতিভূষণের ফর্ম বা টেকনিক কীভাবে পশ্চিমি প্রভাবে স্থিরীকৃত উপন্যাসের মডেলকে ভেঙে দিতে চাইছে। বিভূতিভূষণ শিল্পভাষা ও শিল্প সংগঠনের যে ভিন্ন লজিকে মানবিক দুঃখ ও করুণার জগৎ এঁকেছেন, তাতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও শিল্পাবয়বের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একরকমের প্রতিবাদ জানানোই হয়ে যায়।"[২৭]

বিভূতিভূষণের জীবনের শেষ দশটি বছর তাঁর সমকালের সমাজ-রাজনীতির অনুষঙ্গে বড় বেশি করে মথিত। যুদ্ধ মন্বন্তর- রাজনৈতিক প্রতিরোধ-ব্রিটিশ শাসকের বিরোধিতা-দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগের সেই দুর্বিপাকের দিনগুলিতে বিভুতিভূষণের ভাবনার বলয়েও 'বিপুল তরঙ্গ' উঠেছে। তাই তিনি ১৯৪৫ এর শেষে মীরাট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, "এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকে কান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রাপালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক।"[২৮]

বিভূতিভূষণের শিল্পীমানস উনিশশো তেতাল্লিশে মন্বন্তর- এর দ্বারা বিচলিত হয়, যার

ফলশ্রুতি 'অশনি সংকেত' উপন্যাস। অবশ্য 'অশনি সংকেত' একটি দলছুট রচনা নয়। 'অশনি সংকেত'এর গ্রাম, পথের পাঁচালী'র গ্রামের থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তাঁর কথাবিশ্বে একদিকে যেমন আছে সামান্য নোনাফলের জন্য ইন্দির ঠাকরুণের ভাগ্যে জোটে অকথ্য অপমান, বুনো ফল খাওয়ার লোভে গ্রামের পথে ঘাটে লোভী কিশোরী দুর্গার ঘুরে বেড়ানো, সামান্য ডুমুরের তরকারি ও পানসে পায়েস তাদের মুখে এনে দিতে পারে অমৃতের আস্বাদ। আবার অন্যদিকে রয়েছে নীলফুলে ভরা শাঁখারি পুকুর, ভাদ্র শেষে ফুটন্ত কাশফুলে ভরা মাধবপুরের দূর প্রসারিত চর, ঘুঘু ডাকা অলস দুপুর, পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নার জালে বাঁশ বনের তলা, লেবু ফুলের গন্ধে আকুল ভিটে। আবার অন্যদিকে আছে নিদারুণ শুষ্কতায় জ্বলে ওঠা জঙ্গলের ছবি। প্রাণভয়ে দৌড়ানো নীলগাইয়ের দল। আছে বন কেটে বসতের কথা, আছে পূন্যাহের দিন মুষলধারে বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে চীনা ঘাসের দানা ও গুড়ের জন্য হাভাতেদের ঠেলাঠেলি। সুতরাং আমরা বলতে পারি 'অশনি সংকেত' বিভূতি ভূষণের উপন্যাসধারায় দলছুট নয়, বরং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপনার একটি স্বাভাবিক পরিণতি ,ঔপনিবেশিক শোষণে সুজলা 'সুফলা শস্য শ্যামলা' বাংলার যে কী ভীষণ পরিণতি হয়েছিল তাই তিনি তথ্যপূর্ণভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'অশনি সংকেত' ১৯৪৪ এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৬ এর জানুয়ারি পর্যন্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে মাতৃভূমি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় 'অশনি সংকেত' রচনাও সেখানেই থেমে যায়। পরে ১৯৫৯ সালে অক্টোবর মাসে উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পরম্পরাগত জনসমাজ, পরিবার, মানুষ ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে করে কেমন ধ্বংস হল, তার জীবনযাপনের মর্যাদা হারাল, সে বৃত্তান্ত বিভূতিভূষণ সারা লেখক জীবন ধরেই বলেছেন। এই 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের প্রথম দিক জুড়ে এক প্রাক ঔপনিবেশিক জীবনের

সহজ ছবি এঁকেছেন। ঔপনিবেশিক আওতার বাইরে বাংলার জনসমাজ সহজ-সরল স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবেই বয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেও ভারতীয় সমাজের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার উল্লেখ পাই। "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরহ্লা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল। তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই। সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই- কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেনুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে। গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই। চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত।সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেহ্লা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।"[২৯]

গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী ভাগ্যান্বেষণের জন্য বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করেছে। গঙ্গাচরণের আদি নিবাস ছিল নদীয়াজেলায় হরিহরপুর গ্রামে। কিন্তু সেখানে জ্ঞাতিশত্রুতার জন্য সে পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে এল ভাতছালা। তারপর সেখান থেকে পরিবার নিয়ে এ গ্রাম, সে গ্রাম ঘুরে নতুন গাঁয়ে এসে থিতু হয়েছে। গঙ্গাচরণ গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত জাতপাতের সুবিধা আদায় করেছে। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব অভিমত হল যে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ বসতি কম, সেখানে বসতি করলে নিম্ন বর্গীয়দের কাছ থেকে ব্রাহ্মণত্বের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারা যায়। তাই নতুন গাঁয়ে সে একটি পাঠশালা খুলে নিয়ে গ্রামের ছেলেদের পড়িয়ে সেখানকার লোকেদের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছে। তার ঘরে কলু দিয়ে যায় তেল, গোয়ালা দিয়ে যায় দুধ, হ্লেতের ফসল, গাছের ফল, মাছ, টাটকা উৎকৃষ্ট গরুর ঘি— সবকিছুই আজ্ঞামাত্র তার ঘরে

এসে হাজির হয়। সে গ্রামে একমাত্র ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে সকলের কাছে এক বিশেষ মর্যাদা পায় গঙ্গাচরণ। গ্রামে অশিক্ষিত কাপালী ও গোয়ালাদের ছেলেদের পড়িয়ে পণ্ডিতমশাই সেজে বসবাস করতে লাগল। গঙ্গাচরণকে কিছু বাস্তববুদ্ধি ও ভড়ং প্রয়োগ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানীগুণী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সে ছলনা এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। আবার কাপালী বা শূদ্রের পুরোহিত হতে তার আপত্তি নেই। কারণ অজ পাড়াগাঁয়ে ও সব কে দেখতে আসছে। কিন্তু যখন তার ছেলে পটল জমিতে বাঁশ কঞ্চি নিয়ে বেড়া বাঁধতে যায়, তখন সে 'ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে বেড়া শোভা পায় না' বলে ছেলেকে তিরস্কার করেছে। আসলে চালাকি করে একটু ভালো খাওয়া ও থাকার জন্য নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গে আপস করলেও ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে সে গৌরবান্বিত। ধমনীতে বয়ে যাওয়া রক্তের মতো এই জাতপাতের বিচার বাংলাদেশের গ্রামে ছিল স্বাভাবিক। এ নিয়ে কারো মনে কখনো প্রশ্ন জাগে নি; একেই সকলে স্বাভাবিক বলে জেনেছিল। কিন্তু উপন্যাসে আমরা দেখবো এই মন্বন্তর বর্ষপ্রাচীন জাতিপ্রথার অচলায়তনকে কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে।

গল্পের শুরুতে গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গের সুখী গৃহকোণের ছবি থাকলেও প্রথমেই গ্রামের নদীতে কুমীর ভেসে আসার সংবাদে লেখক একটি প্রতীকের মাধ্যমে যেন মূল সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। নদীতে দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। একজন প্রৌঢ়া আর একজন তরুণী। "প্রৌঢ়া বললে— ও বামুন দিদি ওঠো- কুমির এয়েছে নদীতে।"[৩০] সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনপ্রবাহ বয়ে চলা এক শান্ত, ক্ষুদ্র, নিস্তরঙ্গ গ্রামে হঠাৎ প্রাণঘাতী 'কুমির এর আবির্ভাব যেন এক প্রাণঘাতী বিপদের মতো, অবশ্য কোথাও দুর্ভিক্ষের বা আগন্তুক দুঃসময়ের তিলমাত্র আভাস নেই। উপন্যাসটিতে সময়ের হিসেব পাওয়া যায় না। অবশ্য 'খেজুর রসের উল্লেখ থেকে ধরে নেওয়া যায় শীতকাল থেকে আখ্যানের শুরু। তারপর ফাল্গুন মাসের

উল্লেখ পাই। "যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল।"[৩১] কিন্তু তখনো পর্যন্ত ভবিষ্যত দুর্যোগের কোনো খবর আমরা পাই না। হঠাৎ কামদেবপুর গ্রামে ওলাওঠা মহামারীর আকার ধারণ করলে পণ্ডিত গঙ্গাচরণ 'পাঠশালার স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই অনুসরণে এবং লোকদেখানো পূজো আচ্চার মাধ্যমে গাঁ বন্ধ করতে যান। সেইসময় প্রথম চালের দাম বাড়ার ব্যাপারটি শোনা যায়। কামদেবপুর গ্রামেরই একজন বলল "পণ্ডিতমশাই, চাল বড্ড আক্রা হবে, কিছু চাল এ সময়ে কিনে রাখলে ভালো হয়। চালের দর ঠিক বাড়বে..... মণে দু'টাকা চড়াও আশ্চর্য নয়।[৩২] কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করল না। কারণ ১৯৪২ এর আগের দুই বছরে চালের দামে স্থিতাবস্থা ছিল বলে জানা যায়। তাই হয়তো কেউ আমল দেয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবে গ্রামবাংলার এই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ এক পরিবর্তন দেখা দিল। কামদেবপুর থেকে ফেরার পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য ওঁর হাত ধরে বললেন "আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন, ঘরে একদানা চাল নেই। চালের দাম হু হু করে বাড়ছে। ছিল সাড়ে চার, হোল ছ'টাকা। এই যুদ্ধুর দরুণ নাকি অমনটা হচ্ছে।"[৩৩] দীনু ভট্টাচার্যের এই কথায় গ্রামীণ দারিদ্র্য যুদ্ধের বাস্তবের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেল। যুদ্ধের অভিঘাতেই যে ক্রমশ ভেঙেচুরে যাচ্ছে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির কাঠামো এখানে অতি সাধারণ ভাবে বলা কথাটায় সে তাৎপর্য রয়ে গেল।"[৩৪]

এই গ্রামবাংলায় যুদ্ধ ব্যাপারটা বড় কেউ বোঝে না। এমনকি গঙ্গাচরণ ও মাঝে মধ্যে যুদ্ধের কথা শোনে বটে কিন্তু এই অজ চাষা গাঁয়ে কেউ খবরের কাগজ নেয় না, শহরও সাত আট মাইল দূরে। যুদ্ধের সব খবর এরা কেউ জানে না। তবে এটুকু জানে যে যুদ্ধ আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানী আর জাপানের। সব জিনিস নাকি আক্রা হয়ে উঠবে।"[৩৫] সব জিনিষপত্রের দাম বাড়ার জন্যই সরল জীবনের ওপর নেমে আসে খাদ্যাভাব। যুদ্ধের জন্যই যে অভাব, তা ধীরে ধীরে মানুষের বোধগম্য হয়। বৈশাখের মাঝামাঝি বাজার থেকে জিনিস কিনতে গিয়ে

গঙ্গাচরণ আরও কিছু আশ্চর্যকর পরিবর্তন লক্ষ্য করল। "প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশ চড়ে যাচ্ছে। .... ক্রাসিন পাওয়া যাচ্ছে না। ..... দোকানদার পরামর্শ দেয়, 'বাবু এই বেলা কিছু নুন আর কিছু চাল কিনে রাখুন— ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে তাহলে কষ্ট স্রেষ্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে।'

আর বাড়ি ফিরে এসে গঙ্গাচরণ তার জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা জানায় স্ত্রীকে— "পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম।"[৩৬] আর গ্রাম্য সারল্যে অনঙ্গ এসব কথা উড়িয়ে দেয়— "দূর! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা, চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোক বাঁচতে পারে কখ্খনো?"[৩৭] এখানে বৈশাখ বলতে ১৩৫০ সালের বৈশাখ অর্থাৎ ইংরাজি ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মে মাস। ঐতিহাসিকেরাও এই সময়ে, অর্থাৎ মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মন্বন্তরের চরম অবস্থা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। এই মন্বন্তরকে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। (১) ১৯৪২ - এর আরম্ভ থেকে ১৯৪৩ এর মার্চ পর্যন্ত, (২) ১৯৪৩ - এর মার্চ থেকে ১৯৪৩ এর নভেম্বর, (৩) ১৯৪৩ এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ - এর প্রায় শেষদিক পর্যন্ত।"[৩৮]

ফাল্গুন মাসের শেষে "পাঠশালা ফিরতি গঙ্গাচরণকে কামদেবপুরের দুর্গা ভট্টচায জানায়,'চালেরমণ হয়েছে দশ টাকা।' সেই রাতে দুর্গা পণ্ডিত গঙ্গাচরণের আতিথ্য নেয়। তার খাওয়া দেখে বোঝা যায় সত্যিই 'পৌনে সাতটাকা মাইনে'তে তার আর চলে না। হয়তো বেশ কিছুদিন সে পেটভরে খায় নি। চোখের সামনে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। কেরোসিন তেলের সঙ্গে এবার দেশলাই ও বাজার থেকে উধাও। গ্রামের ধনীরা যাদের বাড়িতে গোলা আছে' তারা একভাবে চালিয়ে নেয়। কিন্তু আট নটা পুষ্যি নিয়ে দুর্গাপণ্ডিতের আর চলে না। যুদ্ধ সংক্রান্ত সব খবরই গঙ্গাচরণের কাছে অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া। জাপানীরা ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েছে, "যেখান থেকে 'রেঙ্গুন চাল আসে।' গঙ্গাচরণ জানেও না ঠিক

কোথায় রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। কিন্তু তার বিষময় ফল ভোগ করে সে বা তার মতো সাধারণ মানুষেরা। লেখকের বর্ণনায় তার বাস্তবরূপ দেখি "ধান চাল গেল কোথায়! এক দানা চাল কোথাও পাওয়া গেল না। অত বড়ো গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে যাচ্চে চালের অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে। কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল বস্তা সাজানো থাকতো বালির বস্তার দেওয়ালের মতো, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ।"[৩৯] খাদ্যাভাবের, অন্নাভাবের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে।

খাদ্যাভাব মানুষকে নানারকম অপরাধ কার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। চারিদিকে চলতে থাকে অবাধ লুঠতরাজ। চালের অভাবে খেতে না পেয়ে নিরন্ন মানুষ রাধিকানগর বাজারের পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ করে। অন্নাভাবে মানুষ আর মান-সম্ভ্রম ধরে রাখতে পারে না। হ্লি ধের জন্য অন্যের ঘরে পুষ্যি হতেও বাধে না। দুর্গা ভট্টচার্য সপরিবারে গঙ্গাচরণের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। বিশ্বাস মশায় বলে — "এবার যে রকমডা দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে। কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না। না খেয়ে আবার লোক মরে ? কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেচে। জুটে যায়ই কোনো না কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিষ,সে দেশে লোক না খেয়ে মরবে?"[৪০] প্রথম প্রথম প্রতিবেশিদের কাছ থেকে ধান ধার করলেও শেষে প্রতিবেশির কাছেও আর ধার মেলে না, সকলেই ধার করতে চায়, এদিকে চিঁড়ের দামও বাড়তে লাগল, দু'আনা সেরের চিঁড়ে হল বারো আনা।

উপন্যাসে কোথাও কিন্তু অজন্মার জন্য খাদ্যশস্যের অভাব ঘটেছে এ কথা বলা হয় নি। বরঞ্চ উপন্যাসে জানা যায়, অভাবের বিভিন্ন কারণের অন্যতম হল এই যে ব্ল্যাক মার্কেটের ফলে বেশি দাম পেয়ে চাষিরা মজুত ধান বিক্রি করে দিয়েছিল। এছাড়া এই মন্বন্তরে ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী যারা অকৃষিজীবী তারাই সবচেয়ে বেশি হ্লতিগ্রস্ত হয়েছিল। উপন্যাসটিতে দেখা যায় যে মতি বাগদিনী বা মতি মুচিনী ভাতছালাতে অনঙ্গ বৌ এবং তার

পারিবারকে অনাহারের মুখের থেকে অনেকবার বাঁচিয়েছে নানা রকম খাদ্যের যোগান দিয়ে — সেই মতি মুচিনীই মন্বন্তরের কবলে পড়ে দুটো ভাতের জন্য অনঙ্গ বৌএর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে জানায় তাদের দুরবস্থার কথা: "অত বড় মুচি পাড়া ভেঙে গিয়েছে দিদি ঠাকরুণ।"[৪১] তাদের পুরুষরা কে কোথায় চলে গিয়েছে। আর শিশুরা, মেয়েরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কেউ মরেছে,কেউ বা ধুঁকছে। "শুধু দ্যাখো মুচি পাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে, ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলে নেমেছে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে। নেতু বুনোর ছোট মেয়েটা তা ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।"[৪২] এই মুচিপাড়ার মানুষদের উপজীবিকা ছিল বিল থেকে মাছ ধরে বিক্রি করা।

সেই জেলেরা আর হ্লে তমজুরেরা অর্মত্য সেনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে দুঃস্থতার মানদণ্ডে ছিল সবার উপরে।[৪৩] ঘর ছেড়ে যারা শহরের পথে পা বাড়িয়েছিল তাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। 'অশনি সংকেত' এ হ্লে তমজুরদের দেখা যায় না অবশ্য, কিন্তু জেলেদের উপস্থিতি রয়েছে। দেখা যায় দুঃস্থতার তালিকায় অন্যান্য পেশার লোকজনদের — যাদের কারোরই জমি নেই। সে তালিকায় জেলের পর আছে গয়লা— যে একটু উচ্চবর্গের খাদ্যবস্তুর যোগানদার। তারপর অন্যান্য কারিগররা, আছে অন্যান্য অনুৎপাদক উৎপাদক উপজীবিকার মানুষ। জেলে নবীন পাঁড়ুই বলে: "আধপেটা খেয়ে আছি দু'দিন। চাষীদের ঘরে ভাত আছে। আমাদের তো নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপেহ্লা বেশি।[৪৪] না খেতে পেয়ে যে মেয়েটি ভোরবেলা কচুর শাক তুলতে যায় নদীর ঘাটে। সেও এক জেলে বউ— কাঁদতে কাঁদতে সে জানায়— "তিনদিন আজ কারো পেটে লক্ষ্মীর দানা সেধোঁয় নি।"[৪৫] স্যাকরা দীনু নন্দীর ব্যবসা অচল। কেন না "এই দুর্দিনে গহনা কে গড়ায়"[৪৬] দুবেলা খাওয়া

হয়নি তার। চালের সন্ধানে ধামা হাতে ঘুরে বেড়ায়। ভূষণ ঘোষের বৌ— গয়লাদিদি কাদার মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে গেঁড়ি গুগুলি সংগ্রহ করে। তার দুদিন পেটে ভাত যায় নি। সনাতন ঘোষ যার বাড়িতে অনেকগুলি গরু সেও জানায় , দু দিন না খেয়ে আছে বাড়ির লোক'।[৪৭] অনুৎপাদক উপজীবিকার মানুষ— পুরোহিত - পণ্ডিতের দুঃস্থতার ছবি তো বিশেষভাবে প্রাধান্যই পেয়েছে এ উপন্যাসে।

দুঃস্থতার পরিসংখ্যানে সবশেষে আছে সেই সব চাষি যাদের জমি আছে। আর আছে ভাগচাষিরা। কাপালীরা সেই রকম চাষি। কাপালীদের হ্লেতে ধান থাকারই কথা। তবুও তাদেরও কেন যে অচলাবস্থা ঘটেছিল তা বোঝা যায় কাপালীদের মেয়ে ভানুর কথায়- "হ্লেতের ধান আর কনে। ছ'টাকা মণ যেমন হোল অমনি কাকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ী পুরে। বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে। ফি জনে জুতো কেনলে, কাপড় কেনলে, কাকীমা ঘটি বাসন কেনলে, মাছ খালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে, নবাবী করে সে টাকাও উড়িয়ে ফেললে। এখন সে ধান ও নেই, সে টাকাও নেই।"[৪৮] তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকেও এই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ ছবিটা বদলে যেতে লাগল—"পথে ঘাটে ক্রমশ ভিখিরির ভিড় বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন... পাঁচ-ছটি অর্ধ- উলঙ্গ, জীর্ণ-শীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা- ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো— ফ্যান খাইতাম, ফ্যান খাইতাম।"[৪৯] ভাতের অভাব এখানে স্পষ্ট। ভাতছালা থেকে এলো অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণকায়া মতি মুচিনী। খাদ্যাভাবে পড়ে মানুষ কেউ খাচ্ছে শুধু কলাই সেদ্ধ, ছোলা সেদ্ধ, কেউ বনের ওল বা কচু। তারও অভাবে মানুষ খাচ্ছে বনের শাকপাতা, গাছের ফল মূল, চুনোমাছ, শেষকালে শুধুই পাতা। কাপালীদের ছোটো বউয়ের সরল স্বীকারোক্তি অন্নাভাবের দিকটিই তুলে ধরে— "কাওরা পাড়ার মাগী মিনসে এসে গাঙের ধারের যত শুষনি শাক, কলমি

শাক, হেলেঞ্চা শাক তুলে উজোর করে নিয়ে যাচ্ছে দিন রাত। .... ওই খেয়ে আজ দুদিন বেঁচে আছি— ওই সব শাক আর ছোলা সেদ্ধ।"[৫০] শাক পাতার অভাবে মানুষ খেয়েছে গেঁড়ি গুগলি। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এভাবেই মানুষ অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। আর এ সমস্ত কিছুর মূলে যে যুদ্ধ সেকথা গ্রামের চাষা-ভুষো লোকেরাও জানে। কিন্তু কার সঙ্গে কার আর কেনই বা যুদ্ধ এ খবর গ্রামের সাধাসিধা, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষজন জানবেই বা কী করে। এই অজ চাষা গাঁয়ে কেউ খবরের কাগজ নেয় না। তবে যুদ্ধের বাজারে সবারই এক দশা। কচুর ডাঁটা সেদ্ধ খেয়েই বেঁচে থাকার আকুল চেষ্টা দেখা যায় রয়ের বৌ-এর কথায়। তিনদিন তার পেটে দানা পড়েনি শুধু কচুর শাক খেয়ে আছে — "কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই যুদ্ধের বাজারে? যুদ্ধের আক্রা ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠেনি, গাঙের ধারে বড় বড় কচুর ডাঁটা হয়েছে, তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শুধু সেদ্ধ।"[৫১] ভাতের অভাবে গ্রামের দাসপাড়ার বিলে মেয়েরা জলে নেমে পদ্মগাছের মূল তুলছে। গেঁড়ি গুগলি তুলছে। এমনকি জলঝাঁকির পাতা পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। অন্নাভাবে নিরন্ন মানুষ ভিক্ষাপাত্র হাতে গ্রামান্তর থেকে ফ্যান ভিক্ষা করতে আসে।

হাটে টাকার বিনিময়ে ও চাল পাওয়া যায় না। ক্রেতারা খালি হাতে ঘরে ফিরে আসে। ঘরে বিরাজ করে আরও শূন্যতা। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকে সন্তান পরিবার। দিনকে দিন ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে চলে। গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে দুটো ভাতের আশায়, ফ্যানের আশায় ভিখিরিরা ফিরে চলে।

অনাহারের অসহ্য জ্বালায় মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কথা লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কাপালীদের ছোটবৌ চাল যোগাড় করবার জন্য নিজের শরীরটুক বিক্রি করে। তৎকালীন সমাজে এই রকমই কাপালী বৌ-দের মতো অসহায় নারীদের অসহ্য খিদের জ্বালা মেটাতে যদুপোড়ার মত নৃশংস নারীলোলুপ মানুষদের কু প্রস্তাবে সম্মত হতে

হয়। নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে মিলেছে সামান্য আধপালি চাল— "কাপালী বৌ আধঘন্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধপালি চাল! পেছনে পেছনে আসছে যদু পোড়া।"[৫২] দুর্ভিক্ষের দুরবস্থার সুযোগে নরপশুরূপী যদুপোড়ার দল নারীর সম্মানকে করেছে লাঞ্ছিত। খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়ে অসহায় নারীর নারীত্বকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের এক নিকৃষ্টতম নিদর্শন হোল এইসব ঘটনা। এছাড়া সেই দুর্ভিক্ষের দিনে নারীদের আরেক ধরণের বৃত্তির কথা জানা যায়। তা হল ধান ভানার উপজীবিকা।[৫৩] সেই সময় বহু মেয়ে ধানভানার উপজীবিকা গ্রহণ করেছে এবং ধান ভানার মজুরি হিসেবে যা ধান পেয়েছে তাই দিয়ে তারা সংসারের লোকেদের মুখে ভাত জুগিয়েছে।। 'অশনি সংকেত'এ অনঙ্গবৌ কাপালীদের মেয়ে ভানুর কাছ থেকে জানতে পারে হ্লুদে গয়লার নাতবৌ লোকের বাড়ি আটকাঠা ধান ভেনে এক কাঠা বানি পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ধান ভানার উপজীবিকা নেওয়া স্থির করে ফেলে। যদিও সমীহ্লা অবশ্য বলে যে মেয়েদের স্বামী নেই, শুধু তারাই ধান ভানার উপজীবিকায় এসেছিল। কিন্তু উপন্যাসে যে পরিস্থিতিতে স্বামী থাকতেও অনঙ্গ বৌকে ধান ভানার কাজে নামতে হয় তা মোটেই কোনো বানানো পরিস্থিতি নয়। এই উপন্যাসে কাহিনি বয়নে দুর্ভিক্ষের বাস্তব বিবরণ রয়েছে, কোথাও কোনো অতিরঞ্জন নেই।

উপন্যাসের কাহিনির চূড়ান্ত পরিণতি যা আসলে দুর্ভিক্ষেরই চরম পরিণতি স্বরূপ নেমে এসেছে, তা হোল অনাহারে, মতি মুচিনীর মৃত্যু। এতদিন গ্রামের মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল যে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। মানুষ ভাবতেই পারে না গাছে এত ফল থাকতে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে "বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে?.... কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়ে মানুষ তাহলে মরতে পারে।..... মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কতলোক দেখতে আসছে. দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজ যা ওর হয়েছে, তা

তো সকলেরই হতে পারে। ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল।"[৫৪] যা মানুষের কাছে অকল্পনীয় ছিল তাই যেন সত্য হয়ে উঠলো।

মতি মুচিনীর মৃত্যু সেই গ্রামে অনাহারে মৃত্যুর প্রথম ঘটনা— অশনি সংকেত। মতির মৃত্যু গ্রামের সমস্ত মানুষকে সচকিত শঙ্কিত করে দিল। লেখকের বর্ণনায়— "একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে আছে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি সংকেত।"[৫৫]

অবশ্য এই খাদ্যাভাবের কথা বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণ কিন্তু কোথাও বলেন নি যে, অজন্মার জন্য খাদ্যশস্যের অভাব হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন মন্বন্তরের একটা বড় কারণ হল বর্মার পতনের পর বর্মা থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে যাওয়া । এছাড়াও ব্ল্যাকমার্কেটের ফলে বেশি দাম পেয়ে চাষি মজুত ধান বিক্রি করে দিয়েছিল। এছাড়াও ব্যবসাদাররা মজুত খাদ্যশস্য অন্য নিরাপদ স্থানে পাচার করে দিয়েছিল। অর্থাৎ দেশে খাদ্য ছিল কিন্তু সুষম বন্টন হয় নি এবং আরো বেশি লাভের লোভে বেশি টাকার বিনিময়েও আড়তদাররা সাধারণ মানুষকে চাল বিক্রি করতে চায় নি। অত্যধিক দাম যারা দিতে পেরেছিল তারা অবশ্য কিছু কিছু পেয়েছিল। উপন্যাসে গঙ্গাচরণ অনঙ্গবৌ- এর সোনার জিনিস বিক্রি করে চাল আনতে যায়। কাজেই বিভূতিভূষণের মতে এই মন্বন্তর মনুষ্যসৃষ্ট। অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকেরা একথাই বলেছেন— চালের অতিমাত্রায় মজুতদারি— ভয় পেয়ে, আবার মুনাফার লোভও মন্বন্তরের অন্যতম কারণ। প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে তথ্যসহ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। 'অশনি সংকেত' এর বিশ্বাস মশাই এবং কুণ্ডুমশাই এই ধরনের মজুতদার। বিশ্বাসমশাই সম্পন্ন গৃহস্থ আর কুণ্ডু মশাইয়ের চালের দোকান আছে। কুণ্ডুমশাই এর ইচ্ছে বেশি মুনাফায় চাল বাইরে পাচার করবেন। যে রকম আড়তদার খাঁ-বাবু সব ধান বেচে

দিয়েছে গবর্নমেন্টের কন্ট্রাকটরের কাছে। গঙ্গাচরণ তাকে মিনতি করে বলে "বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে"।[৫৬] এইভাবে গভর্নমেন্টের ভুল নীতিও যে মন্বন্তর সৃষ্টিতে জড়িত ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে উপন্যাসটিতে। গ্রামের মানুষগুলোও এর খবর রাখে। তারা শুনতে পায়, পুলিশে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্য। মেয়ে মজলিশে একজন বলে "ধান নাকি সব গবরমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে।"[৫৭]

দুর্ভিক্ষের দুর্বিপাকে সরল-শান্ত-স্বচ্ছল-সুখী চরিত্রগুলিও নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। কাহিনির শুরুতে গঙ্গাচরণের ব্রাহ্মণ্য অহংকার ও অধিকারবোধ প্রবল ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে আকাল শুরু হওয়ায় তার চরিত্র দ্রুত বদলে যেতে লাগল। খাদ্যাভাবের দিনে ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানোর কোনো অবকাশই আর কারো রইল না। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেঁচে থাকাটাই বড়ো হয়ে উঠল। আত্মবিশ্লেষণ করে গঙ্গাচরণ "জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা"।[৫৮] ব্রাহ্মণ্য অহংকার তাদের ঘুচে গেল। পরিবর্তে এই চরম বিপর্যয়ের সময় গঙ্গাচরণ ও দীনু ভট্টাচার্যের মধ্যে জেগে ওঠে মানবধর্ম। মতি মুচিনীর মৃতদেহ সৎকারের মধ্য দিয়ে লেখক মানবধর্মকেই জয়ী করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে কোনো বড়ো বিপর্যয় মানুষের জীবনেও বড়ো পরিবর্তন বয়ে আনে। এখানে জাতি ধর্ম সংস্কারের উর্ধ্বে মানবিকতার ধর্মকে জয়ী করেছেন। একদিকে এই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ যেমন হাজার হাজার মানুষের প্রাণকে নষ্ট করেছে, মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতাবোধ ও সহমর্মিতা বোধও জাগিয়েছে এই দুর্ভিক্ষই।

দুর্ভিক্ষে কাপালীদের ছোটবৌ প্রথম দিকে চরম অন্নাভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও শেষপর্যন্ত হার স্বীকার করেছে চূড়ান্ত ক্ষুধার কাছে। আধপালি চালের জন্য সে 'সতীত্ব'কে

বিক্রি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। অনঙ্গবৌ এর স্নেহধন্যা কাপালী বৌ ফিরিয়ে দিয়েছে যদুপোড়াকে। শেষরহ্লা পেয়েছে সে চরম সর্বনাশের হাত থেকে।

কিন্তু গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গ বৌ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণী মূর্তিতেই বিরাজমান। চরম বিপর্যয়ের দিনে, দুর্ভিহ্লের প্রতিক্রিয়াতেও চরিত্রটির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নিজেদের চরম খাদ্যাভাবের দিনেও অতিথিপরায়ণতা ও স্থৈর্যকে বজায় রেখেছে। সহজেই বোঝা যায় বিভূতিভূষণ তার মধ্যে দিয়ে নারীর মঙ্গলময়ী চিরকল্যাণী মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই তার মধ্যে দিয়েই নতুনের আর্বিভাব ঘটিয়েছেন লেখক। আসলে লেখক বলতে চেয়েছেন প্রবল ধ্বংসের মধ্যেও সৃষ্টি থেমে থাকে না। প্রচণ্ড দুর্ভিহ্লের দিনেও যেন প্রকৃতিরই জয় ঘোষিত হয়েছে। এখানেই লেখকের বিশিষ্টতা; এখানেই শিল্পীর শিল্পের সার্থকতা। এই উপন্যাসে আমরা মনে করি চরিত্রগুলোর সঠিক উত্তরণ ঘটেছে। বিভূতিভূষণ দুর্ভিহ্লের পটে মানবতার বিপন্নতার ছবিই শুধু আঁকেন নি, তার থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখানেই মানবদরদী বিভূতিভূষণের দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য। শান্ত -নিস্তরঙ্গ-স্বচ্ছল গ্রামীণ জীবনে তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর বা উনিশশো তেতাল্লিশের ভয়াল দুর্ভিহ্ল যে বীভৎস থাবা বসিয়েছিল তারই বাস্তব দলিল হিসেবে 'অশনি সংকেত' বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩

সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮- ১৯৫৬) পঞ্চাশের মন্বন্তর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল তার 'চিন্তামণি' উপন্যাসটি এবং ছোট গল্প সংকলন 'আজ কাল পরশুর গল্প'। এই সমস্ত গল্পে মানুষের দুর্ভিহ্লকালীন বিভিন্ন দুর্ভোগ, দুঃখ যন্ত্রণা, মূল্যবোধের অবহ্লয়, নৈতিক অধঃপতন- ইত্যাদি দিকগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

'চিন্তামণি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার দু'বছর

পূর্বে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। লেখক সমসময়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছিলেন। 'চিন্তামণি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধকালীন অন্নাভাবের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন একেবারেই সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবনে। উপন্যাসটি আয়তনে নিতান্তই হ্রস্ব। তবুও এই উপন্যাসটির স্বল্প পরিসরে লেখক একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে এক ভিন্নতর রীতির সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। পটভূমির স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা রচনায় লেখকের শিল্প সাফল্য অবশ্য স্বীকার্য।

মানিকের 'চিন্তামণি' উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম বাংলা। উপন্যাসের মূল চরিত্র গৌরাঙ্গ একজন চাষি। চিন্তামণি খেতে না পেয়ে পেটের দায়ে বিদেশে দাসীবৃত্তি করতে আসা একজন গৃহস্থ নারী। এই দুজন ছাড়াও লেখক আরও কিছু চরিত্রের মাধ্যমে সেই সময়ের টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। লেখক নিটোল গল্পের মাধ্যমে নয়, বরং বিভিন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে টুকরো টুকরো চিত্রের সাহয্যে সেই অন্ধকার সময়ের ভয়াবহতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। " উপন্যাসে তাঁর কাছে কোনো অখণ্ড কাহিনী-ধারা নয় তথাকথিত নায়ক-নায়িকার জীবনের একটি সুসংবদ্ধ সুগ্রথিত বিন্যাসমাত্র নয়— তাঁর উপন্যাসে পাই জীবনের এক চলমান শোভাযাত্রা। অজস্র নরনারীর সমস্যাহ্লাদ গ্রন্থিল জীবনের আপাত-খণ্ডিত প্রকীর্ণ ছবির সমাহারে রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসধৃত ল্যাণ্ড-স্কেপ- ধর্মী ছড়ানো জীবনের সংবেদন।"[৫৯] হ্রস্ব দ্রায়তন এই 'চিন্তামণি' উপন্যাসটির ফ্রেমে "এক বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রপটকে নিবদ্ধ করার ব্যাপারে লেখককে বিশেষ সহায়তা করেছে উপন্যাসে ব্যবহৃত একাধিক চিঠি।"[৬০]

'বৈন' চিন্তামণিকে লেখা তার দিদি হরমণির পত্রগুচ্ছের লিপিতেই উৎকীর্ণ হয়েছে দুর্ভিক্ষকালের নির্মম ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা, আর হরমণির মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষাতেই ওইকালের গ্রামবাংলার আর্থিক ও নৈতিক সংকট প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সার্বিক খাদ্যাভাব দেখা দিলে পেটের জ্বালায় স্বভূমি ত্যাগ করে চিন্তামণিকে

চলে আসতে হয়েছে মধুবনীতে। — সেখানে 'হরেরাম রাইস মিলের' মালিক নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়িতে। 'বৈনে'র এই সংকটে হরমণি কাতর কিন্তু নিরুপায়। খিদিরপাড়া চব্বিশ পরগনা থেকে সে চিন্তামণিকে চিঠি লিখেছে। চিঠির তারিখ ২০শে শ্রাবণ। অর্থাৎ ঘোর বর্ষাকাল। চিঠিতে সে লিখেছে "এই দুর্দিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের হুধায় মধুবনী গিয়াছ, এই দুহু আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হুঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে। .... নবিন আষাড় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০ টাকা দিয়াছে। কি কাজ করে জানিনা. ... আমার খাওয়া চলে না।"[৬১] আমরা জানি এই দুর্ভিক্ষে নারীরা বিশেষ করে যুবতী নারীরা বিপন্ন ও আক্রান্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বড়লোকবাবুর বাড়িতে সমর্থ যুবতী বিধবাদের দাম অনেক বেশি। পটল ভাবে "রাঁড়ীর নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে! তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিনবেলা খাক?.... এমনি রাঁড়ী পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ। বুড়ী নয় যে চহু শূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে।"[৬২]

কত মেয়ে কল কারখানায় খাটতে চলে যায় শুধুমাত্র মাসের শেষে মাইনে পাবার আশায়। অবশ্য তাতে তাদের স্ত্রীধর্ম খোয়াতে হয়। কারণ চারধারে হায়েনার দল। সেখানে নারীত্ব বজায় রাখা যায় না বলে হরমণি চিন্তামণিকে আসতে দিতে চায় না। হরমণি যে নিজের পেটের জ্বালায় শেষপর্যন্ত বড়নিছিপুরের ভুষনবাবুর বাসায় কাজ নিয়েছে। নইলে সেও না খেয়ে মরত. 'বৈন'কে লেখা চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট বলেছে... "তুমি আট টাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিষপত্র আগুন হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলা পিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে।"[৬৩] প্রয়োজনীয় জিনিস দুর্মূল্য হয়ে চলেছে। অন্নাভাবে গরিব মানুষ ঘর ছাড়ছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাজার থেকে লোহা উধাও হয়ে গেছে। কামারের দোকানে নতুন কাজ হচ্ছে না। সারাইয়ের কাজ হচ্ছে। রূপার দাম বেড়ে গেছে। লেখক এখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিক মুনাফালাভের চিত্র

তুলে ধরেছেন। বাজার থেকে তাঁতিদের কাছ থেকে অল্প মূল্য দিয়ে সব কাপড় কেনা হয়ে গেছে। সেই কাপড়ই আরো অধিক মূল্য দিয়ে তাদের চোখের সামনেই বিক্রি হচ্ছে। অথচ বাজারে সূতা নেই। সুতরাং তাঁতিদের তাঁতশাল বন্ধ। ইঁদুনাখার বরুণ তাঁতি কেঁদে বলল, "হায়রে ঝকমারি একা বুনি দু'চার খানা, তাতে কি ভাই সংসার চলে? দশজনেরটা কিনে এনে বেঁচে আছি দু চার গণ্ডা লাভে পেয়ে। শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল; ভাবলাম বড় দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেঁয়ে, দু'য়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে সূতোর আমদানী নেই, কোথা পাব সুতো! কিছু আছে দিতে পারি, তার দর কিছু বেশি লাগবে। কি দর জানো? সোনার দর! আর সালে সোনা কিনিছি এই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে! তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। একি হল কাণ্ডখানা?"[৬৪] আর যার কাছে কাপড় আছে, সে আরো বেশি লাভের লোভে বেচতে চাইছে না। আবার যদি দর পড়ে যায় তবে তো অনেক হ্লতি। অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে পাগলপ্রায় অবস্থা। চালেরও অবস্থা তদ্রুপ। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে। "চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গৌরের চাল বাড়ন্ত, দুধ বেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে চালের মণ বারো টাকা, মোটা ভাঙ্গা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে'। সেই ধানের চাল বারো টাকা।"[৬৫] টাকা থাকলেও ধান পাওয়া যায় না। লেখক এখানে বিশ্বযুদ্ধ কালীন গ্রামীণ পরিস্থিতির পঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে আসন্ন দুর্ভিহ্লের পদধ্বনি শুনিয়েছেন। এছাড়াও 'বৈন' চিন্তামণিকে লেখা মোট ছ'টি চিঠির মধ্যে দিয়ে লেখক দুর্ভিহ্ল কালীন দিনগুলির কঠোর বাস্তবতা ও দুঃসহ দিনগুলির নির্মম জীবন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে দেখি গ্রামের মানুষজন যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। জাপান বা বিলাত দুই-ই তাদের কাছে বিদেশ, তারা যুদ্ধকে মনে করে বিদেশিদের

যুদ্ধ। নিজেদেরকে কোনোভাবেই তার সঙ্গে যুক্ত বলে ভাবতে পারে না। "বিদেশে বিদেশীদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষীদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে? জাপান যুদ্ধে নেমেছে? জাপান ও তো বিদেশী। বিলিতি মাল আসে মধুবনীতে। জাপানী মাল আসে। বিলাত ও যেমন বিদেশ, জাপনও তাই।[৬৬] অর্থাৎ নিজেদেরকে তারা কোনোভাবেই তার সঙ্গে যুক্ত বলে ভাবতে পারে না। শুধু যুদ্ধের কারণে আনুষঙ্গিক নানা সমস্যার দ্বারা যখন তারা পীড়িত হয় তখন তারা চমকে ওঠে। এমনিতেই বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সঙ্গত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। চাষিদের জীবনে এমনিতেই নানা সমস্যা, কখনো ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হয়, আবার কখনো বীজধানের অভাব। কারণ অভাবের তাড়নায় বীজধান খেয়ে ফেলে। তারপর ঋণের বোঝায় জেরবার হয়ে ফসলের অধিকাংশই দিয়ে দিতে হয়। "ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, ঋণের বোঝায় চাষী কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক্ কটা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেয়ে এখন বাজু পৈছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়ছে। পেট ভরে কজনেই বা কবে তারা খায়। এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে আধেক নেমে গেছে সেই অ্যাত টুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় ক'জনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুসী খুসী দেখাত তাদের মুখ, সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা।"[৬৭] মার্কসবাদী লেখক এই গরীব কৃষকদের জীবনের যাতনার কথা মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তবুও তার মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলেছিল। কিন্তু আচমকা যুদ্ধের চাপে তাদের অবস্থা বেসামাল হয়ে গেল। যুদ্ধের চাপে যখন তাদের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে তখন তারা ধীরে ধীরে সচেতন হয়। কোনো মতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলিও যখন এলোমেলো হয়ে ওঠে, যখন তেল-নুন-মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রি বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা ব্যাক্তিগতভাবে যুদ্ধের ধাক্কা টের পায়। আবার কতকগুলি দরকারি জিনিস হঠাৎ করেই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। দুর্দিনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরে। অন্ন বস্ত্রের অভাব মানুষকে

রীতিমতো চিন্তিত করে। সুতোর অভাবে সব কটা তাঁত বন্ধ। সাধারণ মানুষ হ্লতিগ্রস্ত হয়। চোরাবাজারের ভয়াল অন্ধকার গর্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, ওষুধ-পত্র সব চলে যায়। উপন্যাসে দেখি চোরাবাজারের ফুড চলে যাওয়ায় সময়মতো ফুড না পাওয়ায়, অকালে সময়মতো ওষুধ বাজারে না পাওয়ায়— বাবুর পুত্রের বিনা ওষুধে মৃত্যু ঘটে।

এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র গৌরাঙ্গ তথা গৌরের দৃষ্টিদর্পণেই কাহিনিতে এসেছে গ্রাম-বাংলার শ্মশান হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ। আকালের দিনে মানুষে মানুষে সম্পর্কেও ভাঙন ধরেছে। মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে হয়তো কিছুটা অসহায়ও। গৌরেরর চাঁদকাকা গৌরের সঙ্গে সারা জীবন শুধুমাত্র শত্রুতাই করে গেছে। বেঁচে থাকতে গৌরকে সম্পত্তি থেকে ঠকিয়েছে। শাশুড়ির মোহরের প্রতি তার লোভ ছিল। তাই মাটিতে লুকানো সেই রূপার টাকাগুলিকে চুরি করার অনেক ফন্দি সে করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে জানতে পেরেছে তার শাশুড়ি সেগুলোর বিনিময়ে কাগজের টাকা নিয়ে এসেছে। তারপর ভাতের অভাবে সপরিবারে না খেতে পেয়ে মরেছে। কিন্তু তাঁর মেয়ে পুঁটুকে গৌর আশ্রয় দিয়েছে। পুঁটুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য গৌরের সঞ্চিত চাল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেছে। তার ঘরের চালে "আরও কয়েকদিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কি ভাতটাই খায়, এতটুকু মেয়ে। কম দিয়ে এড়িয়ে যাবার যো নেই, যতহ্লণ না পেট ভরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য'।[৬৮]

গৌর এতদিন পেটের জ্বালা সেভাবে ভোগ করেনি। কিছু ধান সে আর রঘু লোভে পড়ে বেচে দিয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি বেচেনি। তাই ওদের বাড়িতে এখনো দুবেলা ভাত রান্না হচ্ছে। গৌরের বাড়িতে চাল ফুরিয়ে এলে সে রঘুর বাড়ি থেকে কিছু চাল চেয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু একই উদ্দেশ্য নিয়ে আরেকবার রঘুর বাড়িতে গেলে রঘু বিশেষ খুশি হয় নি। ধারে নেওয়া চাল ফেরত দিতে রঘু তাকে অনুরোধ করে। এভাবে গৌর দেখে তার

আশেপাশে চেনা লোকেরা কীভাবে বদলে যাচ্ছে। "গৌরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গরু ছাগলের মত চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে। দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে দুদিন পরে তার কি অবস্থা হবে এই চিন্তায়"[৬৯] চালের জন্য তার ও রঘুর, এতদিনের বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে গৌর। এই সময় গৌরকে রঘু জানায় "নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।... কার সাথে গেল? ভগমান জানে, পটল নাকি পেছনে ছিল শুনলাম— সহরে সরিয়েছে।"[৭০] সে সময়কার আরেকটি সত্য যে অনেক মেয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। অনেক দালাল মেয়ে কেনাবেচা করেছিল। লেখক এখানে সে তথ্যটাই তুলে ধরেছেন। তাছাড়া যে সকল মেয়ে পেটের তাড়নায় বাড়ির বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাদের যে কী অবস্থা হয়েছিল তা আমরা হরমণির চিঠির মাধ্যমে জানতে পারি। হরমণি পেটের জ্বালায় ফৌজদের ব্যারাকে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে অন্নাভাবের দিনে নারীরা সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখতে পারে না, প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে,— "আমার মতো শতাধিক পোড়াকপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম নাই, সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে, কোনোমতে ধর্ম রাখিয়াছি।"[৭১] হরমণি এসময় মোক্ষম কথাটি বলে "না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি।" লেখক অতি অল্প কথায় সে সময়কার এই সব হতভাগ্য মেয়েদের মর্মবেদনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে এঁকেছেন। নিজে যে অবস্থার মধ্যে পড়ে দিন কাটাক না কেন বোনকে সেই অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে নারাজ। "যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাইনা"।[৭২]

দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে গ্রামবাংলা যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে তা গৌরের চোখ দিয়ে লেখক জানিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়— "যুদ্ধ বিধ্বস্ত শোষিত গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়লব্ধ অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার জন্য গ্রামের মানুষের নানাবিধ

সমস্যা বর্ননায় লেখক গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকেই ধিক্কার জানিয়েছেন।"[৭৩]

গৌর একে একে তার মা, পুঁটুকে হারায়, তাছাড়া কালাচাঁদের পরিবারের সকলে মারা গেছে। "দু চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে— মানুষ ও গরু ছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে।"[৭৪] চারদিকের এই নিস্তব্ধতায় গৌরের নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। যতদিন পর্যন্ত জমিজমা, বাসনপত্র, ঘর-দুয়ার ছিল ততদিন পর্যন্ত মানুষগুলো কোনোমতে বেঁচে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে একে একে গৌরর মা মরল, পুঁটু মরল। গৌর পৃথিবীতে একা হয়ে গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সর্বনাশা মন্বন্তর পীড়িত সাধারণ মানুষগুলোর শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক সংকটের কঠিন বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে এই 'চিন্তামণি' উপন্যাসটিতে। লেখক ছোটো-বড়ো নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের পরিচয় এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু কারো কারো মতে 'উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য উল্লেখযোগ্য নয়। গল্পরস আকর্ষণ করে না। কাহিনিও সংহত সুবিন্যস্ত নয়। গ্রাম্যজীবনের দারিদ্র্য, জীবনযুদ্ধ, আশঙ্কা, আশ্বাস, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যাভাবসৃষ্টি, অনাহার, রোগের শিকার, অকাল মৃত্যু, সমস্ত ঘটনাই এখানে ব্যক্ত কিন্তু তা নিষ্প্রাণ বর্ণনায় পর্যবসিত হয়েছে। চরিত্রগুলি বিকশিত হয়নি। গৌর ও চিন্তামণির সম্পর্কটি সাজানো মনে হয়। তাদের হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ যথেষ্ট মানবিক হয়ে ওঠেনি।"[৭৫] তবে উপন্যাসটির সাহিত্যিকমূল্য যাই হোক, এই একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল রচনা করতে বসে লেখক এই সংকটের নিদারুণ মারের মুখে দাঁড়িয়েও জীবনের প্রাণপনে টিঁকে থাকার গল্প শুনিয়েছেন। তাই সামাজিক ভ্রুকুটির ভয় ভেঙ্গে গেছে গৌরের। চিন্তামণিকে নিয়ে বড়নিছিপুরে কারাখানায় কাজ করার কথা বলেছে। "আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ি নেই, জমিজমা নেই, পেটেরভাত নেই— কাকে তার

ভয়। কিসের তার লজ্জা"।[৭৬] অর্থাৎ কৃষক থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে যাচ্ছে সে। সেখানে সে চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে। তাতে থাকবে না সমাজের নিয়মভাঙ্গার ভয়। এভাবে মন্বন্তর সে সময় যেমন শ্রেণিবিন্যাসকে পাল্টে দিয়েছিল তেমনি সামাজিক নিয়মকেও শিথিল করে দিয়েছিল। এভাবেই ভবিষ্যত জীবনে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে চিন্তামণি ও গৌর। "এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে? তার চাইতে চল বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে। তুমি কাজ করবে, আমি কাজ করব। একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে, সেথায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, একসাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।"[৭৭] হরমণি ও তাই বলেছে. "তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখি হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব, মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রহ্লক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।[৭৮]

এভাবেই লেখক বেঁচে থাকার আখ্যান শুনিয়েছেন। অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিতে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে 'চিন্তামণি' উপন্যাসটির কাহিনিবৃত্তও সম্পূর্ণতা পেয়েছে। দুর্ভিক্ষের তথ্যচিত্রের পাশাপাশি মানবিক অন্তর্জীবনের এই ছবিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি বস্ত্রসংকট চোরাবাজারে, নারী সম্মান হানি ইত্যাদি বিষয়গুলোও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

৪

সমকালীন ইতিহাসের এই ভয়ংকর মানবিক বিপর্যয় থেকে বাংলার প্রধান ঔপন্যাসিকরা যে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন না, তার প্রমাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর আলোচ্য তিনখানা উপন্যাস। 'মন্বন্তর'- 'চিন্তামণি' কিংবা 'অশনি সংকেত'- তিনটি উপন্যাসই 'মন্বন্তর' এর সমকালে রচিত, ফলত ঘটনার উত্তাপ থেকে দূরে সরে পরিস্থিতির স্থির বিশ্লেষণের প্রবণতা উপন্যাসগুলিতে একটু কমই দেখা যায়।

আর উপন্যাসের অন্যতম যা লহ্ণ চরিত্রায়ন— বাইরের ও ভেতরে নানামুখী সংঘাত ও সংলাপে এক একটি ব্যক্তি চরিত্রকে অনন্য করে গড়ে তোলা— তাও সঙ্গত কারণেই এই তিনটি উপন্যাসে দেখা গেল না। বরং উপন্যাসে লাগল রিপোর্টাজ বা সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদনের ধর্ম। মৃত্যুর মহামিছিলে দাঁড়িয়ে শৈল্পিক কৌশলে চরিত্র গড়ে তোলা— ধারাবাহিক, দ্বন্দ্বময়—আদিঅন্ত-মধ্য সমন্বিত প-টসৃষ্টির প্রযন্ত নয়, বরং প্রতিদিনকার বিবরণ, 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং' রীতিতে ঘটনাপ্রবাহকে তুলে ধরা এই লেখনপদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন ঔপন্যাসিকেরা। শৈলীতে সামান্য অভিনবত্বের ছোঁয়া আছে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে, যে উপন্যাসটি মন্বন্তরের ভয়াবহতা থিতিয়ে আসার পর লেখা। তিনটি উপন্যাসেই শেষ পর্যন্ত প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে এক হন্তারক সময়। আবার তিনজন লেখকই এই ঐতিহাসিক পর্যবেহ্ণ নিজেদের মতে করে উপস্থাপিত করেছেন যে, এই মন্বন্তর মনুষ্যপৃষ্ট, এ একান্তই প্রকৃতির মার নয়। যে চক্রান্তে কৃষক হারিয়েছে ঘরবাড়ি-জমিজমা, মা হারিয়েছে সন্তান, স্বামী হারিয়েছে পত্নী, নারী হারিয়েছে সম্ভ্রম, মানুষের যন্ত্রণা হয়ে পড়েছে পন্য। উপন্যাসগুলিতে সেই প্রেহ্লিতবাস্তবতা খোদাই হয়ে রয়েছে। তরাশঙ্করের বিন্যাসে, বিশেষত পরিণতি অংশে যে ভাববাদী কথকতার ভঙ্গি রয়েছে, তাও অবশ্য বাস্তবকে নিরাকৃত করে নি। বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দেখিয়েছেন,তাঁর সমগ্র রচনায় এহেন detouchment দুর্লভ। আর মানিক তাঁর ভাবাদর্শগত অবস্থান থেকেই গৌর-চিন্তামণিকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামী প্রত্যয়কে আকালের পটেও প্রত্যহ্ণগম্য করে তুলেছেন। অবস্থানগত ভিন্নতা রচনাগুলিতে বৈচিত্র্য এনেছে যদিও, তথাপি অন্তরঙ্গ বিচারে তিনটি উপন্যাস মিলিয়েই এক অখণ্ড প্রতিবেদন- এই প্রতিবেদন মানুষের চক্রান্তের, মানুষের নিরাকরণের আবার মানুষেরই ঘুরে দাঁড়ানোর । বাংলার ইতিহাসের মর্মান্তিক এক পর্বকে এই তিনটি বাংলা উপন্যাস সার্থকভাবে দলিলীকৃত(documented) করেছে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ-

(১) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি ঃ 'অশনি সংকেত' কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ৩৯।

(২) 'ফ্যান', প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন, কলকাতা, ১৪১০, পৃ. ২৬।

(৩) রায়চৌধুরী বিনতা ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১১-১৪।

(৪) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ঃ 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' কলকাতা ২০১১, পৃ. ৩০৫।

(৫) গুপ্ত হ্লেত্র ঃ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা ২০০২, পৃ. ৭১।

(৬) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ঃ 'মন্বন্তর', কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ১।

(৭) ঐ, পৃ. ৪৬।

(৮) উদ্ধৃত, পাল শ্রাবণী ঃ 'কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর, অশনি সংকেত', কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২০।

(৯) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

(১০) ঐ, পৃ. ৯১।

(১১) ঐ, পৃ. ১২৭।

(১২) ঐ, পৃ. ২৪০।

(১৩) ঐ, পৃ. ২৭৭।

(১৪) ঐ, পৃ. ৩২৫।

(১৫) ঐ, পৃ. ৩২৭।

(১৬) ঐ, পৃ. ৩০০।

(১৭) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ঃ 'আমার সাহিত্য জীবন' কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৫৫।

(১৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

(১৯) ঐ, পৃ. ১৪১।

(২০) ঐ, পৃ. ১২২।

(২১) ঐ, পৃ. ১৩১।

(২২) ঐ, পৃ. ৩০৬।

(২৩) ঐ, পৃ. ৩৪৭।

(২৪) ঐ, পৃ. ১৪৩।

(২৫) ঐ, পৃ. ৩৪২।

(২৬) ভট্টাচার্য সুতপা ঃ কথাসাহিত্যের একলা পথিক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৯১।

(২৭) রায় দেবেশ ঃ বিভূতিভূষণ ঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা, মুখবন্ধ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ঘ।

(২৮) পাল শ্রাবণী ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

(২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৭৬।

(৩০) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণঃ অশনি সংকেত,কলকাতা ১৪১২, পৃ. ৩।

(৩১) ঐ, পৃ. ১৪।

(৩২) ঐ, পৃ. ২১।

(৩৩) ঐ, পৃ. ২৩।

(৩৪) পাল শ্রাবণীঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

(৩৫) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

(৩৬) ঐ, পৃ. ২৫।

(৩৭) ঐ, পৃ. ২৫।

(৩৮) উদ্ধৃত,পাল শ্রাবণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

(৩৯) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

(৪০) ঐ, পৃ. ৩৯-৪৫।

(৪১) ঐ, পৃ. ৫৩।

(৪২) ঐ, পৃ. ৫৩।

(৪৩) দ্রষ্টব্য, অমর্ত্য সেন, Poverty & Famine প্রবন্ধটি, পৃ. ৫২-৫৭।

(৪৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

(৪৫) ঐ, পৃ. ৪৪।

(৪৬) ঐ, পৃ. ৪৬।

(৪৭) ঐ, পৃ. ৪৬।

(৪৮) ঐ, পৃ. ৩১।

(৪৮) ঐ, পৃ. ৪৩।

(৪৯) ঐ, পৃ. ৪৩।

(৫০) ঐ, পৃ. ৪৮।

(৫১) ঐ, পৃ. ৪৩।

(৫২) ঐ, পৃ. ৬৪।

(৫৩) Sen Amartya : Poverty & Famine. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford India 2007, p. 56-57.

(৫৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

(৫৫) ঐ, পৃ. ৮৪।

(৫৬) ঐ, পৃ. ৩৪।

(৫৭) ঐ, পৃ. ৪২।

(৫৮) ঐ, পৃ. ৭৯।

(৫৯) রায়চৌধুরী গোপিকানাথ ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন দৃষ্টি ও শিল্প রীতি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ ১১৪।

(৬০) ঐ, পৃ. ১১৫।

(৬১) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ঃ 'চিন্তামণি' কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ১০৫।

(৬২) ঐ, পৃ. ১০৭।

(৬৩) ঐ, পৃ. ১৫৯।

(৬৪) ঐ, পৃ. ১৬২।

(৬৫) ঐ, পৃ. ১৬৩।

(৬৬) ঐ, পৃ. ১৬১।

(৬৭) ঐ, পৃ. ১৪৭।

(৬৮) ঐ, পৃ. ১৭২।

(৬৯) ঐ, পৃ. ১৭৩।

(৭০) ঐ, পৃ. ১৭৪।

(৭১) ঐ, পৃ. ১৭১।

(৭২) ঐ, পৃ. ১৭১।

(৭৩) বসু নিতাই ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৬২।

(৭৪) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

(৭৫) রায়চৌধুরী বিনতা ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য ঃ কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮।

(৭৬) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

(৭৭) ঐ, পৃ. ১৭৬।

(৭৮) ঐ, পৃ. ১৭৬।